**মস্কোর বরফবিথী ও একজন সুতপা**

**পর্ব-২৭**

চেয়ার থেকে হুরমুর করে উঠে এসে আর ধরতে পারলো না।

চোখের পলকেই জানালার এক পাশের সোফায় মাথাটা এসে পড়লো। বেশ জোড়ে একটা আওয়াজ হলো। পা দুটি ফ্লোরে ছড়িয়ে আছে। চোখ দুটি বন্ধ।

সেলিম কাছে এসেই সুতপা, সুতপা বলে কয়েক বার ডাকলো। কিন্তু উত্তর মেলল না।

বেয়াই হাতে একটি জলের গ্লাস এনে চোখে মুখে জল ছিটাতে লাগলো। কিন্তু তাতেও কোন সাড়া নেই।

-বেয়াই, আপনি তাড়াতাড়ি নীচে যান। রিসেপসনের মহিলাকে একটা এম্বুলেন্স ডাকতে বলেন। বলবেন ইমারজেন্সী।

বেয়াই রুম থেকে তারাহুরা করে বেড়িয়ে গেলো।

সেলিমকে বেশ চিন্তিত মনে হলো। হাতটি সুতপার নাকের কাছে নিলো। নাহ্ নিশ্বাস স্বাভাবিক। সোফা থেকে মাথাটা ধীরে ধীরে স্বাভাবিক পজিশনে এনে রাখলো। জানালাটা একটু হালকা করে খুলে দিলো। সাথে সাথে হালকা বাতাস এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো রুমটিতে।

টেবিলে রাখা খাবারের প্লেটগুলি সরিয়ে নিয়ে বাথরুমের বেসিনে রাখলো সেলিম। ফোল্ডিং টেবিলটা ভেঙ্গে ওয়ারড্রপের পাশটায় রাখলো। সুতপার কাছে আবার এগিয়ে আসলো। একই অবস্থা। কোন সাড়াশব্দ নেই। আবারো ডাকলো-

-সুতপা, সুতপা, শুনতে পারছো?-কোন সাড়া পেলো না। আবার গ্লাস থেকে চোখে মুখে জল ছিটিয়ে দিলো। হঠাৎ মনে হলো সুতপার চোখের পাতাগুলো নড়ে উঠলো। মুখটা কাছে এগিয়ে নিলো। আবারো নাম ধরে ডাকলো। কিন্তু না। সাড়া দিলো না।

কিছুক্ষন পরেই পেরামেডিক্সের তিনজন এসে রুমে ঢুকলো। দড়জাটা খোলাই ছিলো। ওদের সাথে একটি হুইল্ড স্ট্রেচার ছিলো। দড়জার পাশেই রেখে দিলো। তাদের মধ্যে একজন মহিলা ডাক্তার ছিলো। বেশ লম্বা-চোড়া। চশমার ফ্রেমে বাঁধা চোখ দুটি। রুমে ঢুকেই সুতপার কাছে গিয়ে এক হাতের আঙ্গুলে চোখের পাতাগুলি টেনে তুলে খুব মনোযোগ দিয়ে দেখলো। ঘটনাটি মুখ থেকে শোনার জন্য এবার সেলিমের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো-

-কখন হলো?

-দশ মিনিট হবে

-কিভাবে হলো

সেলিম পুরো ব্যাপারটি সংক্ষেপে বললো।

মহিলা ডাক্তারটি রোগীর পালস চেক করলো, ধমনীতে স্টেথোস্কোপ লাগিয়ে নাড়ির আওয়াজ শুনতে লাগলো। ধীরে ধীরে কফ পাম্প করে প্রেসার চেক করা হলো। তারপর সেলিমকে বললো সুতপার আগে এমনটি হয়েছিলো কিনা?

-হাঁ, আগেও এমনটি হয়েছিলো। পেটের ব্যাথা নিয়ে বেশ কয়েকবার ক্লিনিকেও গিয়েছিলো।

কথা বলতে বলতে মহিলা ডাক্তারটি সুতপার ডান হাতে একটি ইন্জেকসান পুশ করলো। পাশে দাঁড়ানো ছেলেটিকে বললো স্টেচারে রোগীকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। সেলিমের দিকে এবার তাকিয়ে বললো-

-হাসপাতালে নিতে হবে। একটি ব্যাগে সুতপার কিছু জামা -প্যান্ট ও প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস নিয়ে কোন একজনকে রোগীর সাথে আসতে হবে।

-ঠিক আছে-সেলিম উত্তর দিলো। বেয়াইর দিকে তাকিয়ে একটা ব্যাগে সুতপার জামা কাপড় দিতে বললো।

এর মধ্যে ধরাধরি করে সুতপাকে নিয়ে স্ট্রেচারে তুললো।

বেয়াই দৌড়ে এসে ব্যাগটা সেলিমকে দিতে দিতে বললো-

-হাসপাতালে গিয়ে পারলে নীচে ফোন করে একটা খবর দিয়েন। আমি সুতপার রুম বন্ধ করে যাবো। কোন চিন্তা কইরেন না

পেছনে পেছনে এম্বুলেন্স পর্যন্ত এলো বেয়াই। সুতপাকে এম্বুলেন্সে ঢুকানো হলো। সেলিম এম্বুলেন্স উঠতে উঠতে বেয়াইকে বললো-

-আপনি একটু জাকির ভাইকে ফোন করে বইলা দিয়েন এ ঘটনা। তাই আজ যাওয়া হলো না। কি হলো না হলো আমি জানাবো।

-ঠিক আছে-বলতে বলতে এম্বুলেন্সটা চলা শুরু করলো।

রাস্তার বাঁকে এম্বুলেন্সটি অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত বেয়াই নিথর পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইলো। বাঁ হাতের দুআঙ্গুলে দুচোখে আলতো করে চেপে ধরে ঝাঁপসা জল মুছে নিলো।

এবার আস্তে আস্তে হোস্টেলের রিসেপ্সনে এসে দাঁড়ালো বেয়াই।

চোখে মুখে ভাবনারা দলা পাঁকিয়ে আছে। কপালে গুটি গুটি ঘাম জমা হচ্ছে।

লুদমিলা চেরেস্কভা নিথর চোখে বেয়াইর দিকে তাকিয়ে আছে। খুব ভালো মহিলা লুদমিলা। বয়েস সত্তরের কাছাকাছি। রিসেপ্সনে কাজ করছে গত পাঁচ বছর ধরে। সারাটা জীবন কমিউনিটি স্কুলের শিক্ষক ছিলো। স্বামী কাজ করতো কালেকটিভ সোসাইটির ডাইরেক্টর হিসেবে। সন্তান বলতে একটি ছেলে। ইউনিভার্সিটির খুব নামকরা প্রফেসর। থাকে অন্য শহরে। ভ্লাদিমীর। ছুটি পেলেই মস্কোতে মা-বাবার কাছে চলে আসে। দুই ছেলে-মেয়ে। নাতি-নাতনী ছেলে-আর ছেলের বউকে নিয়ে বেশ দিব্যি কেটে যায় কয়েকটা দিন। হৈ চৈ আর রান্না-বান্নার ব্যাস্ততায় কাটে দিনগুলি। যখন চলে যাওয়ার দিনটি আসে লুদমিলার মনটা খারাপ হয়ে যায়। স্বামী চুপ করে বসে থাকে। সেদিন কথা খুব কম বলে।

এই কথাগুলো লুদমিলাই একদিন বেয়াইকে বলেছিলো।

খুব মিশুক লুদমিলা। মুখে সবসময় একটা হালকা হাসি লেগে থাকে। বিরক্তির কোন ভাব নেই। সবাইকে কোন না কোনভাবে সাহায্য করার মধ্যেই যেন তার আনন্দ।

সুতপাকে সে খুব পছন্দ করে। একটিই বাঙালী মেয়ে এই হোস্টেলে। সুতপাকে সেলোয়ার-কামিজ পড়া দেখলে সে খুব খুশী হয়। মনটা আনন্দে ভরে উঠে। অপুর্ব ছিলো লুদমিলার সবচেয়ে প্রিয়। অপুর্ব লুদমিলাকে মায়ের মতো ভালোবাসতো। প্রতি নিউ ইয়ার আর খ্রীষ্টমাসে লুদমিলাকে নানা ধরনের গিফট দিতো অপুর্ব। কয়েকবার স্তালোভায়ায় এক সাথে খেয়েছে। সবসময় অপুর্ব পে করত। লুদমিলার চোখ তখন ভিজে উঠতো। অপুর্ব চলে গেছে এ কথা শুনেছে সেলিমের কাছ থেকে। খুব কষ্ট পেয়েছিলো সেদিন। তারপর থেকে সুতপার সাথে দেখা হলেই কথা বলতো। সবসময় সুতপার খবর নিতো সেলিম কিংবা বেয়াইর কাছ থেকে।

কি অদ্ভুত মানুষের সম্পর্ক। দেখতে দেখতে কখন যে নিজের অজান্তেই সুতপা, অপুর্বকে ভালোবেসে ফেলে লুদমিলা। কি অমলীন মায়ের ভালবাসা। কি অপার স্নেহ এবং নিঃস্বার্থতা। সব মায়েরাই তাদের সন্তানদের মুখে হাসি ফোটাতে কতো কিছু না করেন। ছেলে মেয়েদের আনন্দ যেন মায়েদের আনন্দ। মায়ের ভালোবাসাই ভালোবাসার পবিত্রতম রূপ। এই মহাবিশ্বের কোন কিছুর সাথে এর তুলনা করা যায় না। সন্তানের প্রতি মায়ের যে ভালোবাসার অনুভূতি তা বর্ণনা করা যায় না কোন কবিতার ছন্দে কিংবা গল্পে শব্দের জলসিড়িতে। তাকে শুধু অনুভব করতে হয়।

বেয়াই যেন হঠাৎ আৎকে উঠলো লুদমিলাকে দেখে। চেয়ার থেকে উঠে টেবিলের পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলো। চোখ দুটি ভেজা ভেজা। চোখে-মুখে কি এক বিষন্নতার ছাপ। কারো অপেক্ষায় যেন দাঁড়িয়ে আছেন কিছু জিজ্ঞেস করবে বলে। বেয়াইকে সামনে দেখেই বলে উঠলেন-

-সিনক, সুতপার কি হয়েছে। সিনক বলেই লুদমিলা সবসময় সম্বোধন করতো। সিনক মানে ছেলে।

-হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে। মাঝে মাঝে পেটে ব্যাথা হতো। আগেও কয়েকবার পলিক্লিনিকে নিয়ে যাওয়া হয়।

-আশা করি সব ঠিক হয়ে যাবে। কোন হাসপাতালে নিয়ে যাবে?

-কিছুই বলে নাই। তবে হাসপাতালে গিয়ে সেলিমভাই এখানে ফোন করবে। আমাকে একটু ডেকে দিও। আমি রুমে থাকবো। অথবা তুমি হাসপাতালের নম্বরটা রেখে দিও। পরে এসে আমি তোমার কাছ থেকে নিয়ে নেব।

-ঠিক আছে, সিনক

এম্বুলেন্সটি প্লানেরনায়া ধরে মেট্রো ষ্টেশনের পাশ দিয়ে এগিয়ে চলছে। একজন ডাক্তার সুতপাকে নানাভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে। ইনজেকশন দেওয়ার বেশ কিছুক্ষন পরেই সুতপার জ্ঞান ফিরেছে। তবে পেটের ব্যাথাটা বেড়েছে। দুটা পেইনকিলার জলের সাথে মিশিয়ে সুতপাকে দিয়েছে। সবটা গিলতে পারেনি। কিছুটা খেয়েই ওয়াক করে ফেলে দেয়। শরীর খুব দূর্বল। সেলিম পাশের চেয়ারে বসে বসে সুতপাকে দেখছে আর বলছে-

-চিন্তা করো ন। হাসপাতালে যাচ্ছি। সব চেক আপ করা হবে।

সুতপা একেবারে নিশ্চুপ। ফ্যাল ফ্যাল করে সেলিমের দিকে তাকিয়ে আছে। চোখের দুকোন বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। সেলিম হাত দিয়ে মুছিয়ে দিতে গেলে সুতপা এক হাত দিয়ে সেলিমের হাতে চেপে ধরলো। হাতটা মুখের কাছে চেপে ধরে ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কাঁদতে লগলো-

-একি তুমি কানতেছ কেন? অসুখ-বিসুক থাকবেই। চিন্তা কইরো না-সেলিম সান্তনা দেওয়ার চেষ্টা করে।

-সেলিম ভাই, আমার শরীর খুব খারাপ। পেটে প্রচন্ড ব্যাথা। আমি মনে হয় আর বাঁচবো না-এই বলে জোড়ে জোড়ে কাঁদতে লাগলো।

সুতপার কান্না দেখে ডাক্তারটি সান্তনা দেওয়ার চেষ্টা করলো। বুঝালো যে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে সব টেষ্ট করা হবে। মস্কোর সবচেয়ে নামকরা হাসপাতাল নম্বর-৭ এ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। পলিক্লিনিক থেকে ঐখানে নিয়ে যাওয়ার জন্য পারমিশন দেওয়া হয়েছে। এই হাসপাতালে সব আধুনিক ব্যাবস্থা। ভালো চিকিৎসা হবে। কান্না থামাতে অনুরোধ করলো।

কিন্তু তাও ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কাঁদছিলো। ওড়না দিয়ে নাক মুখ ডান হাতে মুছছিলো। হঠাৎ সেলিমের দিকে দূর্বল চোখে তাকিয়ে বললো-

-সেলিম ভাই, আমি বাঁচতে চাই

-এই সব কিতা কও। মরনটা এতো সহজ না। তুমি চাইলেও মরতে পারবা না। তুমি একেবারে ঠিক হইয়া যাইবা। এ নিয়া ভাইবনা।

প্লানেরনায়া ষ্ট্রীট ধরে এয়ার কম্বো পার হয়ে এম্বুলেন্সটি মই পারিখমাখেরের বিশাল প্রশস্থ রাস্তা ধরে এগুতে থাকলো সোজা। রাস্তাটি বেশ লম্বা। প্রায় বিশ মিনিট পরে এম্বুলেন্সি ডান দিকে টার্ন করে উলিস্যা স্পাবোদিতে ঢুকে। আরো কিছুক্ষন যাওয়া পর এবার এম্বুলেন্সটি উলিৎসা খিমিনকি হয়ে লেনিনগ্রাদস্কি প্রসপেক্টে এসে পড়লো। এই রাস্তাটিতে প্রায় সময় যানজট থাকলেও আজ তেমনটি ছিলো না। তাই এম্বুলেন্সটি সাঁ সাঁ করে এগিয়ে চললো। ভদনি ষ্টেডিয়াম হয়ে, বেগবায়া পার হয়ে এম্বুলেন্সটি প্রায় এক ঘন্টা দশ মিনিট পর মালোদেজনায়া মেট্রোটি পাশে রেখে মার্শাল টিমোশেঙ্কো স্ট্রিটে এসে পৌঁছালো। বিশাল এক পুরনো লোহার গেট পাড় হয়ে দুপাশের অজস্র গাছ-গাছালিকে ছাড়িয়ে এক সময় হাসপাতালের ইমার্জেন্সী গেইটের সামনে থামলো।

সেলিম কিছুই ঠাহর করতে পারলো না। জায়গাটি বেশ অচেনা। এর আগে কখনো এখানে আসেনি।

এম্বুলেন্সটি থামার সাথে সাথে দুইজন লোক এসে এম্বুলেন্স থেকে সুতপাকে ভিতরে নিয়ে গেলো। সেলিমও পেছনে পেছনে ভিতরে গেলো।

কিছুক্ষনের মধ্যেই একজন মধ্যবয়সী ডাক্তার এলেন। সুতপা তখন যন্ত্রনায় কাতরাচ্ছে। পেট টিপে টিপে দেখলেন। দুই একবার সেলিমের দিকে তাকালেন। মুখটা বেশ চিন্তিত মনে হলো। হঠাৎ সেলিমকে বললো-

-ঠিক সময়ে এনেছিস।

-কোন কিছু সিরিয়াস?-চিন্তিতভাবে সেলিম তাকায়।

-হাসপাতালে যেহেতু আনতে পেরেছিস, চিন্তা করিস না। আগে কয়েকটা টেষ্ট করাতে হবে। তারপরে বলা যাবে কি করতে হবে। তুই এখানেই থাকিস।

-ওকে কি হাসপাতালে থাকতে হবে?-সেলিম জিজ্ঞেস করে

-আগে টেষ্টগুলো হোক। -এই বলে ডাক্তার সামনে এগিয়ে গেলেন।

কিছুক্ষন পরে একজন নার্স এসে সুতপাকে নিয়ে গেল। যাওয়ার সময় সেলিমকে এখানেই অপেক্ষা করতে বলে গেলেন। সেলিম কিছু জিজ্ঞেস করতে গেলে থামিয়ে দিয়ে বলে গেলেন কি কি টেষ্টহবে। কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট টেষ্ট সহ, ইউরিন পরীক্ষা, পেটের একটা এক্সরে এবং তলপেটে একটা আলট্রাসনো করা হবে, এই বলে একটি প্রিন্টেড কাগজ সেলিমের হাতে দিলো।।

সেলিম বেশ অবাক হলো। অন্য হাসপাতালো এমনটি আগে কখনো দেখেনি। এখান সবকিছুতেই একটা উন্নতির ভাব। হাসপাতালের পরিবেশটাও খুব সুন্দর। পাশের ওয়েটিং রুমে একটি ফিটেড চেয়রে বসে পড়লো।

এখন শুধু অপেক্ষার পালা।

প্রায় দুঘন্টা পর সেই ডাক্তারটি এলো। সুন্দর একটা চিন্তামুক্ত হাসি দিয়ে বললো-সবগুলো টেষ্ট করা হয়েছে। তেমন কোন জটিলতা নেই। তবে যেহেতু পেটে তীব্র ব্যাথা আমাদের সন্দেহ ওর এপেনডিসাইটিসের সমস্যা তাই আমরা ওর অপারেশন করবো। কিছু সময় লাগবে। তুই চাইলে ফিরে যেতে পারিস

-না, না আমি এখানেই থাকবো। কতোক্ষন লাগবে অপারেশনের? আর এপেনডিসাইটিসের অপারেশনে কি হয়?-সেলিম জানতে চায়।

ডাক্তার সেলিমের দিকে তাকিয়ে থাকে। একটু হাসে। তবে বিরক্ত যে হয়নি মুখ দেখেই বুঝা যায়। তারপর বলতে থাকে-

-সুতপার পেটের নীচের ডানদিকে একটি ছেদ করা হবে। পেটের পেশীগুলি তখন আলাদা হয়ে যাবে এবং পেটের অংশটি খোলা হবে। তারপর অ্যাপেন্ডিক্স সেলাই দিয়ে বেঁধে সরিয়ে ফেলা হবে। বেশী সময় লাগবে না। এক ঘন্টার মতো।

-আমি এখানেই থাকবো

-ঠিক আছে।-এই বলেই ডাক্তারটি হন হন করে দ্রুত চলে যায়।

অল্প কিছুক্ষনের মধ্যেই সুতপকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হয়।

সম্পূর্ন অজ্ঞান করেই অপারেশন হবে। সুতপার শারিরীক দূর্বলতার কারনে গভীর ঘুমে রাখার জন্য সাধারণ এনেস্থেশিয়া প্রয়োগ করা হয়। অপারেশন শুরু হয় যথারীতি। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার , অপারেশন করতে গিয়ে ডাক্তাররা একটু অবাক হলেন যখন দেখতে পেলেন এপেনডিক্স ইনফ্লেইমড নয়।

সাধারনত অ্যাপেন্ডিসাইটিস হয় যখন অ্যাপেন্ডিক্স ফুলে যায় এবং পুঁজ থাকে। অ্যাপেনডিসাইটিস অ্যাপেনডিক্সের প্রদাহ। অ্যাপেন্ডিক্স হল একটি আঙুলের আকৃতির থলি যা পেটের নীচের ডানদিকে কোলন থেকে বেরিয়ে আসে।

কিন্তু ডাক্তাররা লক্ষ করলেন সুতপার ডান পাশের ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদান্ত্রের সংযোগস্থলতা বেশ সংকুচিত। আর এই কারনেই ঐ জায়গাটা পেছিয়ে থাকায় সমস্যা সৃষ্টি করছে।

ভালোভাবে খতিয়ে খতিয়ে পরীক্ষা করে দেখলেন ক্ষুদ্রান্ত্রের কিছু টিস্যুতে পচন ধরেছে।

ডাক্তাররা তৎখানাত সিদ্ধান্ত নিলেন ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদান্ত্রের কিছু অংশ কেটে বাদ দিয়ে ক্ষুদ্রান্ত্রের একটা অংশ পেটের বাইরে এনে রেখে দিবে। সিদ্ধান্ত মোতাবেক তাই করার পরিকল্পনা নেয়।

প্রায় ঘন্টা দুয়েক লাগলো অপারেশনটি শেষ করতে। নাড়ীর কিছু অংশ বায়োপ্সীর জন্য ল্যাবে পাঠানো হলো। খুব তাড়াতাড়িই টেষ্ট রিপোর্টি চলে আসে।

হিস্টোপ্যাথলজির রিপোর্ট মতে সুতপার প্রদাহজনক পেটের রোগ। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই সাধারন পরীক্ষায় ডায়াগনজ করা সবসময় সম্ভব হয় না।

এদিকে সেলিমের অস্থিরতা বেড়ে যায়।

বেয়াইকে ফোন করে সব খবর দিয়েছে এর মধ্যে। হাসপাতালের নম্বর, ঠিকানা এমনকি কাছের মেট্রো ষ্টেশনের নামটিও জানিয়ে দিয়েছে।

খবরটি পেয়েই বেয়াই জাকির ভাইকে ফোন করে। যদিও আগে ফোন করে সুতপাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি জানিয়ে দিয়েছিলো। ফোনটি পেয়ে যেন কিছুটা চিন্তা মুক্ত হলেন।

-আমি এখনই হাসপাতালে যাবো। আমার অফিস থকে বেশী দুরে না। ওর এখন কি অবস্থা। কিছু জানেন নি?-বেয়াইকে জিজ্ঞেস করে

-অপারেশন নাকি হইতাছে। এপেনডিক্স না কি বলে-এইডার নাকি সমস্যা। সেলিম ভাই ঐহানে আছে।-বেয়াইর উত্তর

-ঠিক আছে

সেলিম পায়চারি করছে চিন্তিত মনে। প্রায় দুই ঘন্টার উপর হয়ে গেলো। অথচ ডাক্তার বলেছিলো এক ঘন্টার অপারেশন। মনটা ভালো লাগছে না। আবোল তাবোল ভাবনারা মাথায় জেঁকে বসেছে। পাশেই ইমারজেন্সীর ওয়েটিং রুম। অনেকেই ওয়েট করছে । কেউ কেউ কাতরাচ্ছে। কারো অবস্থা গুরুতর। এই সব দেখে আরো খারাপ লাগছে ওর।

আর কিছু ভাবতে পারছে না। অপেক্ষার সময় যেন অতি দীর্ঘ। কাটতে চায় না। আরো ঘন্টাখানিক পার হলো। তবু কাউকে বেড় হতে দেখছেনা অটি (O.T) থেকে।

এমন সময় জাকির ভাই এসে হাজির। সেলিমকে দেখেই জিজ্ঞেস করলো-

-সেলিম কি খবর? সুতপা এখন কই?

-এখনো অপারেশন হচ্ছে।

-কতোক্ষন হইছে?

-তিন ঘন্টার উপর। ডাক্তার বলছিলো এক ঘন্টা লাগবে

-অন্য কোন সমস্যা হয় নাই তো? কেউ কি বেড় হইছে এর মধ্যে?

-না, কাউকে দেখেনি

-ঠিক আছে। আমরা এখানেই থাকি। অপারেশন হলে সুতপাকে বেশ কয়েক দিন হাসপাতালেই থাকতে হবে। সব কিছু জেনে তার পর যাবো

-ঠিক আছে জাকির ভাই।

ঠিক আরো বিশ মিনিট পর অপারেশন থিয়েটারের দড়জাটা খুললো। ডাক্তাররা একে একে বেড়িয়ে আসলেন। সেই ডাক্তারটি যিনি প্রথম সেলিমকে সব বুঝিয়ে বলেছিলো সে সেলিমের কাছে এগিয়ে আসলেন।

-সব ঠিকঠাক মতো শেষ হলো। সুতপাকে এখন কেবিনে ট্রান্সফার করা হয়েছে। ঐখানেই আপাতত কয়েকদিন থাকবে।

-ওর কিসের অপারেশন হলো?-জাকির ভাই ডাক্তারকে প্রশ্ন করলেন।

-Inflamatiory Bowel Disease (প্রদাহজনক পেটের রোগ). -তারপর ডাক্তার সবকিছু বুঝিয়ে বললেন। কেন অপারেশনে সময় লেগেছে এবং এখন কি করতে হবে।

-কয়দিন হাসপাতালে থাকতে হবে?-ডাক্তারকে প্রশ্ন করে সেলিম

-কমপক্ষে এক মাস। বেশীও লাগতে পারে। এক মাস পরে আরেকটা ছোট্ট অপারেশন করতে হবে।

-আবারো অপারেশন?-জাকির ভাইয়ের বিস্ময়তা

-ভয়ের কারন নেই।-তারপর আবার বুঝিয়ে বললেন কেন সেই অপারেশনটার প্রয়োজন।

-তবে ওর শরীর এখন খুব দূর্বল। আগামী কয়েক সপ্তাহ খুব সিরিয়াসলি দেখাশুনা করতে হবে। খাওয়া-দাওয়ায় যেন কোন ত্রুটি না হয়। তাই হাসপাতালে থাকবে।

-আমরা কি একটু ওকে দেখতে পারবো?

-চল, আমার সাথে।-এই বলে ডাক্তারটি ওদের দুজনকে সুতপার কেবিনে নিয়ে গেলো। সেখানে আরো বেশ কয়েকজন রোগী আছে। তবে সবাইকেই বয়স্ক মনে হলো। এই কেবিনটা মহিলাদের জন্য। সুতপাকেই এখানে খুব কম বয়সী মনে হলো। সুতপা দেয়াল ঘেঁসা একটি বেডে শুয়ে আছে। দুচোখ বন্ধ। পরনে হাসপাতালের পোশাক। টু শব্দটিও নাই।

--চিন্তার কারন নেই। ও এখন ঘুমাচ্ছে। মরফিন দেওয়া হয়েছে।-ডাক্তারটি ওদেরকে শান্তনার সুরে বলে।

এক সময় দুইজনই হসপাতাল থেকে বেড়িয়ে আসে। রাস্তায় তখনো দিনের আলো। চারিদিকে সবুজ গাছ-গাছালী মৌনতা ভেঙ্গে যেন জেগে উঠেছে। এক ঝাঁক পাখি মাথার উপর দিয়ে পত পত উড়ে গেল। বাইরে গাড়ীগুলো সাঁ সাঁ করে এগিয়ে চলছে। দুজনেই কথা বলতে বলতে হাসপাতালের গেইটের দিকে এগিয়ে চললো।

সিদ্ধান্ত নেয় আগামীকাল অপুর্বকে ফোন করে সুতপার ব্যাপারটি জানানো হবে।

**চলবে---)**

**ড. পল্টু দত্ত**

শিক্ষক, গবেষক এবং কলামিষ্ট